BANGLADESH JOURNAL OF ISLAMIC THOUGHT, V-16, N-26 (2020)

Copyright ©BIIT

ISSN 1816-689X

# উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে নৈতিক সাহিত্য পাঠদানঃ একটি পর্যালোচনা

**ড. মোঃ মাছউদুর রহমান***

## ভূমিকাঃ

মাতৃভাষা জ্ঞান মানুষ জন্মগত ভাবেই কিছুটা অর্জন করে। এ জ্ঞানের মাধ্যমেই পরবর্তীতে কোন শিক্ষার্থী জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশের আগ্রহ ও স্বাদ অনুভব করে। বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশুনা হওয়ার ফলে আমাদের দেশীয় ছাত্র-ছাত্রীরা সাহিত্য ও নীতি নৈতিকতা সর্ম্পকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উন্নত জ্ঞানার্জন করতে পারছে না। অথচ যেই কোন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য দেশপ্রেম, মানব কল্যাণ ও মানবতাবোধ ইত্যাদি বিষয় জানা ও বাস্তব জীবনে অনুসরণ করা রাষ্ট্র ও সমাজের পক্ষ থেকে যেমন দাবি, শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরও অন্যতম উদ্দেশ্য। এ কথা স্পষ্ট যে সুসাহিত্য শিক্ষা দানের মাধ্যমে মানুষকে সবচেয়ে বেশি মানবিক ও নীতিবান করা যায়। সুসাহিত্যিকগণ তাঁদের সাহিত্যের মাধ্যমে নীতিবাক্য তোলে ধরার চেষ্টা করেন। সাহিত্যে নীতিজ্ঞান লুকিয়ে থাকে বলেই সাহিত্য অধ্যয়নের মাধ্যমে মানুষের মানবিক চেতনার বিকাশ ঘটে এবং পাঠকের মন কুসংস্কারমুক্ত হয়। নীতি বিষয়টা আলাদা শিক্ষা দিলে পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হতে চায় না, সাহিত্যের সাথে শিক্ষা দিলে বিষয়টার পূর্ণতা আসে। সাহিত্য রসের সাথে নীতিটা মিশে থাকে। শুধু সার গোবরে যেমন গাছ বড় হতে পারে না, একে মাটির আশ্রয় নিতে হয়, নীতি বিষয়টাও ঠিক তেমনি। বাংলা সাহিত্যে এমন কিছু মহা পুরুষের জন্ম হয়েছিল যাঁরা আজীবন বাঙালি জাতিকে মানবিক ও নীতি জ্ঞানে সমৃদ্ধ করার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৪-১৯১০), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), শেখ আব্দুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১), বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২), শেখ ফজলুল করিম (১৮৮২-১৯৩৬), ডা: মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৭), এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৬-১৯৩৮), কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ (১৮৬০-১৯৪০), খান বাহাদুর আহছানউল্লা (১৮৭৩-১৯৬৫), ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯), মো: বরকতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৪), মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক (১৮৮৩-১৯৭৬), জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৮-১৯৭৬), প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮) সহ আরও অনেক কবি ও সাহিত্যিক রয়েছেন। তাঁদের লেখা সমগ্র থেকে নীতি জ্ঞান সম্পর্কিত বাছাই করা কিছু প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও উপন্যাস এর সমন্বয়ে কিছু কোর্স বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষার্থীদের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করলে বাংলা সাহিত্য ও নীতিজ্ঞান দুটো বিষয়েই জাতি সমৃদ্ধ হতো এবং জাতি হিসাবে আমাদের দেশপ্রেম, মানবতাবোধ ও ভাষাজ্ঞান অনেক বেড়ে যেত। কর্মজীবনে নীতি-নৈতিকতা সামনে রেখে চললে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে অপরাধ প্রবণতা কমে যায় এবং সুন্দর সমাজ জীবন গড়ে ওঠে। উল্লেখিত বিষয়টি পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

* ড. মোঃ মাছউদুর রহমান সহকারি অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম, e-mail: masuddu_08@yahoo.com

(১) সাহিত্য ও নীতি শিক্ষা বর্জিত আমাদের দেশে যে শিক্ষিত শ্রেণি গড়ে উঠছে তারা প্রাণহীন ও অসার। ইংরেজি ভাষায় মোটা মোটা বই পড়লেও তাদের মধ্যে যেন কিসের একটা অভাব দূর থেকে সাধারণ মানুষ দেখতে পায়। রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী একটু ব্যঙ্গ করেই বলেছেন, "ইংরাজের প্রদত্ত শিক্ষা হইতে আমরা যে কিছুই লাভ করি নাই, এ একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা কথা। যে ব্যক্তি ইংরাজি শিক্ষা একেবারে নিষ্ফল হইয়াছে বলিতে চাহেন, আমরা তাহার সহিত বাহু যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে কুণ্ঠিত নহি।... কিন্তু তাহাতে আমাদের বাহ্য ব্যতীত আভ্যন্তরিক উন্নতি বিশেষ কিছু হয় নাই; আমাদের শরীরে মজ্জা বা শোনিত শোধিত হয় নাই; আমাদের আত্মার পুষ্টি হয় নাই। এ যেন অস্থি চর্মসার চিররোগীকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া রাখা হইয়াছে।"[১] সমাজে যুবকদের মধ্যে চলমান অস্থিরতা ও হতাশা ভাব দূরীকরণে সুসাহিত্য অধ্যয়নের পথ দেখিয়ে দেয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। কোন জাতিকে পাঠ্যাভ্যাসে সমৃদ্ধ করতে হলে নীতি বিষয়ক সাহিত্যই হতে পারে তার প্রবেশ পথ।

(২) প্রত্যেক মাতৃভাষায় এমন কিছু নীতি সাহিত্য রয়েছে যা অধ্যয়নে, পঠন-পাঠনে পাঠককে জ্ঞান সাধনার প্রতি আগ্রহী করে তোলে। যে যেই ডিসিপ্লিনে বা বিভাগে পড়াশোনা করুক না কেন মূল লক্ষ্য একটাই থাকা চাই, মানুষের কল্যাণ, মানবিকতা বা মানবতা। আর এই লক্ষ্য হাসিলের জন্য শিক্ষা জীবনের নৈতিক সাহিত্য ও নীতি জ্ঞান বাস্তব জীবনে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মানব কল্যাণের প্রতি অনুপ্রেরণা যোগায়। সাহিত্যিক শিশির কুমার দাশ আরও স্পষ্ট করে বলেছেন "সাহিত্যের আনন্দ, সাহিত্যের উপভোগ তো একজন বিশ্ববিদ্যালয়ে না এসেই করতে পারেন, বিশ্ববিদ্যালয় তো রসের উপভোগ করার পদ্ধতি শেখাতে পারে না, সাহিত্য বিচারের কিছু পদ্ধতি শেখাতে সাহায্য করতে পারে, তাকে এমন কোনও জ্ঞানের সন্ধান হয়ত দিতে পারে যার দ্বারা তার রসবোধ পরিশীলিত হতে পারে, বিচার বোধ সুতীক্ষ্ণ হতে পারে এবং মূল্যবোধ হতে পারে স্পষ্ট এবং পরিচ্ছন্ন। অর্থাৎ বিদ্যায়তনিক শাস্ত্রের লক্ষ্যই হলো জ্ঞান আর সাহিত্য আনন্দকে বাড়িয়ে তোলার জন্য, গভীর করে তোলার জন্য; সৃষ্টি উপভোগের তৃপ্তিকে আচ্ছন্ন করার জন্য, ব্যাহত করার জন্য নয়।"[২] তা ছাড়া গবেষণায় দেখা গেছে শিক্ষাজীবন শেষে কর্মজীবনে প্রবেশের পর গাণিতিক বা থিওরিটিকিল বিষয়ে যত দ্রুত আগ্রহ কমে, সাহিত্যে তত দ্রুত আগ্রহ কমে না। পাঠক সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে তার পাঠ্যাভ্যাস চালিয়ে যেতে থাকে। এর সাথে পাঠকের নৈতিক মানদণ্ডও বাড়তে থাকে। আর এই পাঠ্যাভ্যাসই সমাজের কল্যাণ নিয়ে আসে।

(৩) প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পেছনে বছরের পর বছর যে সময় ব্যয় করা হয় এর মূল উদ্দেশ্য কি ? শিক্ষার্থীরা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে এর দার্শনিক তাৎপর্য কি ? তা অভিভাবক, সমাজ ও রাষ্ট্র সবাইকেই ভালভাবে ভেবে দেখা দরকার। "শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে successful করিয়া তোলা নয়, মানুষ করিয়া তোলা-অন্য কথায় বুদ্ধি, বিচারবোধ ও কল্যাণুনারাগে শিক্ষার্থীর চিত্ত ঐশ্বর্যশালী করিয়া তোলা। এ কথা অস্বীকার করিয়া success কেই বড় করিয়া দেখিলে শিক্ষার্থীকে নীতির দিক দিয়া অনেক খানি নিচে নামিয়া যাইতে হয়।"[৩]

---

১. রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী 'ইংরেজি শিক্ষার পরিণাম ', *বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার দুশো বছর*, তপন বাগচী সম্পাদিত (সূচীপত্র : ঢাকা, ২০০৬), পৃ. ১৭৯

২. শিশির কুমার দাশ, 'বাংলা বিদ্যা' *বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার দুশো বছর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭

৩. মোতাহের হোসেন চৌধুরী 'মধ্যশিক্ষা ও অর্থকরি বিদ্যা ' ' *মোতাহের হোসেন চৌধুরী রচনাবলী* (বাংলা একাডেমী : ঢাকা, ১৯৯৫), প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৯৬

আমাদের মধ্যে সব সময়ই একটা ভুল ধারণা কাজ করে যে, ছেলে-মেয়েদেরেকে কাঁচা বয়সে যত ইংরেজি, অংক, থিওরি ইত্যাদি মুখস্থ করাতে পারবো, তার জীবন তত বেশি সুখময় ও সুন্দর হবে। অনেক মা-বাবাকে দেখা যায়, ছেলে-মেয়েরা টিন এজড এ পৌঁছার আগেই তাদেরকে ইংরেজি কবিতা, ইংল্যান্ডের গ্রামার বই, গাণিতিক থিওরি ইত্যাদি বিষয়ে পাকা হাফেজ বানিয়ে ফেলেন। কিন্তু এই প্রিয় সন্তানদের মধ্যে এখন অনেককে দেখা যায় পড়াশোনায় অমনোযোগী, মা-বাবার অবাধ্য, নেশার জগতে আসক্তি হয়ে ঘুরা ফেরা করতে। ঐ মা-বাবারা এখন প্রিয় সন্তানদের নিয়ে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে দৌঁড়াচ্ছেন। এর মূল কারণ মা-বাবা বা অভিভাবক, শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য না বুঝে শিক্ষা দানের দায়িত্ব হাতে নেয়া। "শিক্ষার চরম এবং মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে মানুষ করে গড়ে তোলা। ছেলেদের মনের মধ্যে কেবল তথ্যের বোঝা চাপিয়ে দিলে চলবেনা, তাকে নীতির অনুশীলন করাতে এবং শেখাতে হবে। ছেলের মনে ভালোমন্দের বিচারের ক্ষমতা জাগিয়ে দেয়া দরকার; তার চেয়ে বেশি দরকার, তার মনে ন্যায়ের নির্দেশ মতো চলবার এবং কাজ করবার ক্ষমতা সৃষ্টি করার।"[৪] মানবতাবাদী আদর্শে জাতিকে গঠন করতে হলে সে জাতীয় গ্রন্থ পাঠকদের সামনে আমাদের উপস্থাপন করতে হবে। প্রয়োজনে মহামনীষীদের জীবনাদর্শও পাঠ্যভুক্ত হতে পারে। "প্রকৃত Education দিতে হলে শরীরকে গড়ে তুলতে হবে, মনের মধ্যে জ্ঞানের বাতি জ্বালিয়ে দিতে হবে, সৌন্দর্য ও বাসনাকে সুশৃঙ্খলিত এবং সজাগ করে তুলতে হবে, স্বভাব এবং চরিত্রকে গড়তে হবে এবং মনুষ্যত্বের একটা মহান আদর্শ ছেলেদের মনের মধ্যে স্থায়ীভাবে খাড়া করে দিতে হবে। এসব যদি হয় তাহলেই Education সার্থক হয়েছে বলতে পারা যাবে।"[৫]

শিক্ষিত মানুষের হৃদয়ে যদি মানবপ্রেম না থাকে, তাহলে এ শিক্ষার পেছনে রাষ্ট্রের জনগণ কেন তাদের কষ্ট-র্জিত টাকা দান করবেন? শিক্ষার সাথে নীতি না থাকলে শিক্ষার্থী শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই ভুলে যায়। "এখন আমরা বেশ বুঝেছি ছেলেদের তোতা পাখির মতো বই আওড়াতে শেখালেই চলবে না। তাদের মানুষ করে গড়ে তুলতে হবে। স্বদেশ-ভক্তি, স্বজাতি প্রীতি তাদের মনের মধ্যে সজাগ করে দিতে হবে। তাদের শেখাতে হবে যে, মানব প্রেমই হচ্ছে সব ধর্মের সার, আর মানবের সেবাই হচ্ছে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত।"[৬]

(৪) সাহিত্যের মাধ্যমে নীতি শিক্ষা দিলে, সেই শিক্ষা শিক্ষার্থীর হৃদয়ে গেঁথে যায়। এই নীতি শিক্ষার আলোকে শিক্ষার্থী তার ভবিষ্যৎ জীবন গড়ার স্বপ্ন দেখে। উচ্চ শিক্ষিত হয়েও যদি নীতি জ্ঞান না থাকে বা নীতির চর্চা না থাকে, তাহলে বাস্তব জীবনে সে শিক্ষা সাধারণ মানুষের উপর কল্যাণমূলক কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। "সাধারণ মানুষের একটা ধারণা আছে যে, শিক্ষা দ্বারা মানুষের চরিত্র গঠিত হয়- মনুষ্যত্বের তথা মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটে। সেজন্য শিক্ষিত লোকদেরকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখার রীতি প্রচলিত আছে। বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজের যে স্বরূপ আজ উন্মোচিত, তাতে জনমনের বহু কালের সেই শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম ভেঙ্গে পড়েছে। সেই জন্যই প্রশ্ন: কেন এমনটি ঘটছে। আমাদের দেশে শিক্ষায় মনুষ্যত্ব-উদ্বোধক হয় না কেন ? এ দেশে শিক্ষা মানুষের চরিত্র গঠিত হয় না কেন ?"[৭]

মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব এমনিতেই অর্জন হয় না; হয়ত মহা মানব বা গুরু তাঁর শিষ্যদের কাছে রেখে মনুষ্যত্ব শিক্ষা দিবেন অথবা তাঁদের লিখিত বই পুস্তক পড়ে শিষ্যকে তা অর্জন করে নিতে হবে। কারণ প্রত্যেকটা

৪ . এস.ওয়াজেদ আলি, 'শিক্ষার আদর্শ', *বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার দুশো বছর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩-১০৫

৫ . প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩-১০৫

৬ . আবুল কাসেম ফজলুল হক, 'শিক্ষা মনুষ্যত্ব -উদবোধক হয় না কেন'? , *বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার দুশো বছর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩

৭ . প্রাগুক্ত,পৃ. ৩০৩

মানুষের মধ্যেই ভাল গুণ বা খারাপ গুণ আছে। "মানুষের মধ্যে প্রেমের আকাঙ্খা আছে, আবার লাম্পট্যের প্রবণতাও আছে, মনুষ্যত্বের সাধনায় লাম্পট্যের প্রবণতার উপর প্রেমের আকাঙ্খা জয়ী করতে হয়। মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হয়; মানব শিশুর মধ্যে, মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের সম্ভাবনা থাকে-সমাজ জীবনে সাধনা ও সংগ্রাম দ্বারা সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করে নিজের মধ্যে মনুষ্যত্ব সৃষ্টি করে নিতে হয়।"[৮]

বাংলাদেশে গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে যত দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিবর্গ জেলখানায় ডাল-ভাত খেয়েছেন, তাদের প্রায় সবাই শিক্ষিত। বর্তমানেও যারা নিয়মিত ঘুষ খাচ্ছেন, দুর্নীতি করছেন; তাদের মধ্যে প্রায় সবাই উচ্চ শিক্ষিত। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষকে নীতিবান করতে পারছে না। মোটা মোটা বই পড়ে মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের কোন আচরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও শিক্ষাবিদ আবুল কাসেম ফজলুল হক এই বিষয়ে বলেন- "এই মনুষ্যত্বের বিকাশ শিক্ষার উপর কতটা নির্ভর করে ? আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে, সবচেয়ে শিক্ষিত লোকদের মধ্যেই চরম অ-মানুষ সুলভ আচরণ বেশি। মনুষ্যত্ব বিষয়ে থিসিস লিখে প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি লাভ করতে হলে যে ব্যক্তি সবার আগে সবচেয়ে বড় ডিগ্রি লাভ করবেন, সেই ব্যক্তির মধ্যেই হয়ত দেখা যাবে মনুষ্যত্বের নিদারুণ অভাব এবং অমানুষ সুলভ বৈশিষ্ট্যের প্রাচুর্য।"[৯]

সাধারণ মানুষের ধারণা হচ্ছে, কেউ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করে আসলেই সে একজন জ্ঞানী ও চরিত্রবান মানুষ। তার কাছে গিয়ে একজন নিরক্ষর বা অসহায় মানুষ কখনও ঠকবেন না বা অবিচার পাবেন না। কিন্তু বাস্তবে এর দেখা মিলে না। জনাব হক আরও বলেন- "প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা দ্বারা মানুষের চরিত্র গঠিত হয় না, মনুষ্যত্বও বিকশিত হয় না। শিক্ষা দ্বারা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন ঘটে, নৈপুণ্য বৃদ্ধি পায়, কৌশল জানা যায়। আর তার ফলে শিক্ষিত লোক ভাল কাজ করতে চাইলে অশিক্ষিতের চেয়ে অধিকতর নৈপুণ্যের সঙ্গে করতে পারে; আর শিক্ষিত লোকের প্রবণতা ও মনোবৃত্তি যদি খারাপের দিকে ধাবিত হয়, তাহলে খারাপ কাজও সে অধিকতর নৈপুণ্যের সঙ্গে করতে পারে।"[১০]

নৈতিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা যদি উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থায় না থাকে তাহলে আমাদের ছাত্ররা তা শিখবে কোথা থেকে? পেশাগত জীবনে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই নীতি-নৈতিকতার একটা প্রশ্ন থাকে। আর নৈতিকতার উপর গভীর জ্ঞানই একজন মানুষকে নীতির উপর অটল থাকতে সহযোগিতা করতে পারে। "তবে সমাজে মানুষের মানবি-কীকরণের তথা মনুষ্যত্ব বিকাশের লক্ষেও শিক্ষা হতে পারে, পৃথিবীর অনেক দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সে লক্ষে পরিকল্পিত। মনুষ্যত্ব উদবোধক শিক্ষার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষা অপরিহার্য। মনোবৃত্তির কিংবা মানস-প্রবণতার অপরিহার্য বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষেত্রে আমাদের দেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অবদান সামান্য। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় মানুষের সামাজিক গুণাবলী বিকাশের কিংবা মানবিকীকরণের (Humaniztion of man in society) প্রতি মনোযোগ দেওয়ার কোন সুযোগ শিক্ষক, অভিভাবক, কিংবা ছাত্র কারও জন্যই রাখা হয়নি। এই জন্যই দেখা যায়, যারা সার্টিফিকেটের বিচারে সবচেয়ে শিক্ষিত ও কীর্তিমান, অনেক ক্ষেত্রে নিচতা, হীনতা ও মনুষ্যত্বের অবমাননায়ও তারা সবচেয়ে নিপুণ ও কীর্তিমান। এই লোকেরা শিক্ষিত হয়ে খারাপ কাজগুলো এমনই নৈপুণ্যের সঙ্গে করে যে, সাধারণ মানুষ তা বুঝে উঠতে পারে না।"[১১]

---

৮ . প্রাগুক্ত, পৃ.৩০৩-৩০৪

৯ . প্রাগক্ত

১০ . প্রাগক্ত

১১ . প্রাগুক্ত, পৃ৩০৪

(৫) সামাজিক অবস্থার কথাও কিছু বলতে হয়। সমাজে যেভাবে উন্মুক্ত আকাশ সংস্কৃতি, ইন্টারনেট, ফেইসবুক ও যত্রতত্র পর্নোগ্রাফির ব্যবহার চলছে, তা যদি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনা না হয় তাহলে উচ্চ পর্যায়ে নীতি শিক্ষাদান কোন কাজে আসবেনা। কিছুদিন পূর্বে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী নির্যাতন বিরোধী আন্দোলনের ফলে সরকার ও মহামান্য হাই কোর্ট শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উপর একটি প্রজ্ঞাপণ জারি করেছেন। এই প্রজ্ঞাপন 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে'র মাধ্যমে বাংলাদেশের সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পৌঁছানো হয়েছে এবং সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। যাতে অনেক নিয়ম-নীতির কথা বলা হয়েছে এবং যৌন কর্মকাণ্ড বিষয়ে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তি দানের হুমকি প্রদান করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের যেভাবে অবাধে বিচরণ করার সুযোগ দিয়ে রেখেছেন; সেখানে যৌন কেলেঙ্কারী নিয়ন্ত্রণে নীতি কথা বললে বা শাস্তি প্রদানের হুমকি দিলে কোন ফল হবে বলে মনে হয় না। "মনুষ্যত্বের বিকাশ আংশিকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার উপর ও আংশিকভাবে সমাজ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। সমাজ ব্যবস্থায় যদি মানবিক বৃত্তি-প্রবৃত্তির কল্যাণকর বিকাশের সুযোগ এবং প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে মানুষ নৈতিক বিবেচনা বর্জিত শিক্ষায় যতই শিক্ষিত হোক, মনুষ্যত্বের পথ থেকে বিচ্যুত হবেই। বাংলাদেশে তাই হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাস্তব সম্মত উন্নত নীতি শিক্ষা দিলে তা ব্যবহারিক জীবনে কার্যকর হবে, যদি সে গুলোকে কার্যকর করার মতো সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিবেশ ও মানব পরিস্থিতি দেশে গড়ে তোলা যায়।"[১২] সুতরাং সরকারকে শুধু প্রজ্ঞাপন জারি করলেই চলবেনা, নীতি-নৈতিকতার সাথে চলার সামাজিক পরিবেশও সৃষ্টি করতে হবে। ডিস, ফেইসবুক ও ইন্টারনেট ইত্যাদির মাধ্যমে চলমান অনৈতিক ওয়েবসাইটগুলোও বন্ধ করে দিতে হবে।

(৬) সাহিত্যের সাথে নীতি নৈতিকতার একটা অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক রয়েছে। মানুষের বাস্তব জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর আলোকেই সাহিত্যিকগণ প্রবন্ধ, গল্প ও উপন্যাসকে সাজিয়ে পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করেন। সুতরাং যে সমাজে সাহিত্যের কদর বেশি; সে সমাজে মানবিক, নীতিবান ও হৃদয়বান মানুষের প্রয়োজনও বেশি। "যে সমাজে সাহিত্যের কোনো আদর নাই, তাহা সাধারণত বর্বর সমাজ। কথা কাগজে ধরে অসংখ্য মানুষের দৃষ্টির সম্মুখে ধরার নাম সাহিত্য সেবা। এই যে কথা, এ কথা সাধারণ কথা নয়, এ কথার ভিতর দিয়ে জীবনের সন্ধান বলে দেওয়া হয়, পুণ্যের বাণী ও মোক্ষের কথা প্রচার করা হয়। বর্তমান ও অন্তিম সুখের দ্বার মুক্ত করে দেওয়া হয়। দুর্গত কণ্টকাকীর্ণ আধার পথে কেউ প্রদীপ না নিয়ে চলতে থাকলে-কিংবা আলোর যে আবশ্যকতা আছে; এ কথা উপহাসের সঙ্গে অস্বীকার করে; তাহলে তাকে কি বলা যায়? কোন জাতি সাহিত্যকে অস্বীকার বা অবহেলার চোখে দেখে উন্নত হতে চেষ্টা করলে, সে জাতি আদৌ উন্নত হবে না।"[১৩]

একজন প্রকৌশলী বা ডাক্তার, তাদের কি নীতি-নৈতিকতা বিষয়ক কিছুই অধ্যয়ন করার বা শেখার প্রয়োজন নেই? তাদের পেশা ও কর্ম কি মনুষ্য প্রেম, ভালবাসা ও দেশাত্মবোধ চায় না? বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানে ভবন ধসে মানুষের প্রাণহানি ও ডাক্তারদের অবহেলায় রোগীর জীবন নাশ ইত্যাদি ঘটনায় জনমনে প্রশ্ন ওঠছে তাদের নৈতিকতা নিয়ে, অভিজ্ঞতা নিয়ে নয়। আসলে সব ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে নীতি বিষয়ক কোর্স অল্প পরিমাণে হলেও থাকা বা শিক্ষা দেয়া উচিত। এতে রাষ্ট্র সমাজ ও আগামী প্রজন্ম প্রচুর পরিমাণে লাভবান

---

১২ . ডা. লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র, লুৎফর রহমান, (সম্পাদনা, হুমায়ুন কবির চৌধুরী, চৌধুরী এন্ড সন্স, ঢাকা, ২০০৩) পৃ.১১-১২
১৩ . প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

হওয়ার আশা করা যায়। "দেশকে বা জাতিকে উন্নত করতে চাইলে, সাহিত্যের সাহায্যেই তা করতে হবে। মানব-মঙ্গলের জন্য যত অনুষ্ঠান আছে, তার মধ্যে এইটিই প্রধান ও সম্পূর্ণ। জাতির ভিতর সাহিত্যের ধারা সৃষ্টি কর আর কিছুরই আবশ্যক নাই। কোন দেশকে সভ্য ও মানুষ করবার বাসনা তোমার আছে? তাহলে বিধি ব্যবস্থার সঙ্গে সেই দেশের সাহিত্যকে উন্নত করতে তুমি চেষ্টা কর। মাতৃভাষার সাহায্যে সাহিত্যকে উন্নত করতে চেষ্টা করতে হবে।...সাহিত্যের শক্তিতে দেশের প্রত্যেক মানুষ শক্তিশালী মহাপুরুষ হতে পারে। মানুষের সব বিপদের মীমাংসা সাহিত্যের ভিতর দিয়েই হয়ে থাকে।"[১৪]

মাঝে মধ্যে দেখা যায়, অনেক উচ্চ শিক্ষিত যুবক, কোন মার্জিত আচরণ করতে জানে না, ভাল করে কথা বলতে পারে না। ভদ্রতা, নম্রতা ও শালীনতা ইত্যাদি আচরণের সাথে কোন পরিচয়ই যেন নেই। তাদের পেছনের পরিচয় নিলে দেখা যায়, তারা অনেকেই বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন অথবা জীবনে সাহিত্য ও নীতি বিষয়ক বই পুস্তকের সাথে সংশ্লিষ্টতা ছিল না। যার ফলে সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাথে পরিচয় ঘটার সময় তাদের হয় নি। অথচ এ ধরণের আচরণ সমাজ জীবনে শিক্ষিত মানুষদের থেকে কখনও কাম্য নয়। "যে সকল যুবকের বাঙলা সাহিত্য অর্থাৎ দেশীয় সাহিত্যের উপর প্রভাব নেই-তাদের পরিপূর্ণ শক্তির স্ফুরণ হয় না। তাদের আত্মিক মূল্য জীবনে অনেক কমে যায়। সুসংস্কৃতি, ভাষা, সূক্ষ্ম চিন্তা আপন মাতৃভাষায় প্রকাশ করবার ক্ষমতা মুসলমান যুবকের একটা সহজ পারিপার্শ্বিকতা ঘটে ওঠে না, তারা ভাল করে কথা বলতে পারে না, যেন সব সময় একটা বন্ধন, একটা জড়তার ভাব প্রকাশ্য (public) জীবনে লেগেই থাকে। লোক সমাজে মিশতে গিয়ে বহু চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। লোক চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হলে যেসব সাহিত্যিক গল্প উপন্যাসের ভিতর দিয়ে সূক্ষ্ম ভাবে লোক চরিত্র অঙ্কন করতে পারেন তাদের বই পড়া উচিৎ। সমাজের মধ্যে মানুষের দৈনিক জীবনে যেসব ঘটনা ঘটে, তার সুখ দুঃখের কাহিনী, বিশ্বাস ঘাতকতা, অত্যাচার, প্রতারণা, উন্নত ধর্মজীবন– এসব উপন্যাসে অঙ্কিত করা হয়। সে সব পুস্তক পাঠ করলে মনুষ্য সমাজ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম অ-ভজ্ঞতা জন্মে।"[১৫]

অনেকে আছেন লেখা পড়া শেষ করে উচ্চ ডিগ্রি নিয়ে, বই-পুস্তক আলমারিতে তালা দিয়ে দেন। আসলে একজন শিক্ষিত মানুষের মনের সাথে সাহিত্যের বই পুস্তক সংযোগ থাকলে তাঁর দ্বারা সমাজের উপকার অন্য আট-দশ জনের চেয়ে বেশি হয়। সমাজ ও নিজের জীবনের দুঃখ কষ্টকে সে বেশি উপলব্ধি করতে পারে। "জীবিত মনুষ্যের নতুন নতুন চিন্তাধারার সঙ্গে আমরা যদি যোগ না রাখি, তা হলে আমরা দুর্বল, শক্তিহীন হবো-পদে পদে লাঞ্ছিত হবো। জীবিত জাতির প্রাণের চিন্তা ও ভাবধারা সাহিত্যে ব্যক্ত হয়। সেই সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের যোগ রাখতে হবে, যদি আমরা জীবিত জাতিসমূহের অন্তর্ভূক্ত হতে চাই। মৃতের কোন সাধনা নাই।"[১৬]

উচ্চশিক্ষায় অধ্যয়নরত ছাত্রদের সামনে নীতি বিষয়ক সাহিত্য তোলে দিতে পারলে উন্নত ও আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার পথ আমাদের সামনে উম্মুক্ত হতে পারে; যা মনীষীগণ আশা পোষণ করেছেন। "বিজ্ঞানের বই, উন্নত কবিতা, কাব্য, ভালো উপন্যাস, জীবনী, ইতিহাস, উন্নত চিন্তা এসব নিত্য পাঠ করলে মানুষের প্রভূত কল্যাণ হয়-দিন দিন মানুষ উন্নত হয়। যে সমস্ত যুবকের সৎ সাহিত্যের সঙ্গে সংস্রব নেই, যারা অনুন্নত নিম্ন সমাজে সদা মেশে, কথা বলে, আলাপ করে, ভদ্র সমাজে ওঠা বসা করে না-তাদের রুচি, চরিত্র, ব্যবহার দিন দিন

---

১৪ . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

১৫ . প্রাগুক্ত,পৃ. ১৮০

১৬ . প্রাগুক্ত

জঘন্য ও কদর্য হতে থাকে। অহঙ্কার, অশিক্ষা, মন্দভাব, সংকীর্ণতা তাদের জীবন ও মনকে অজ্ঞাতসারে দুর্গন্ধময় করে, যা তারা নিজেরা বুঝতে পারে না।"[১৭]

(৭) নীতি-নৈতিকতা শিক্ষা দেয় এমন কিছু রচনার পরিচিতি:

| *রচনা* | *লেখকের নাম* |
|---|---|
| উন্নত জীবন | ডা: লুৎফর রহমান |
| মহৎ জীবন | ” |
| মানব জীবন | ” |
| ধর্ম জীবন | ” |
| যুবক জীবন | ” |
| উচ্চ জীবন | ” |
| মহাজীবন | ” |
| ডেলকার্নেগী রচনা সমগ্র | |
| সর্ব্বহারা (সাম্যবাদী কবিতা), সাত ভাই চম্পা | কাজী নজরুল ইসলাম |
| বেতাল পঞ্চবিংশতি | ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর |
| শকন্তুলা | ” |
| ভ্রান্তি বিলাস | ” |
| সীতার বনবাস, কথামালা | ” |
| অনল প্রবাহ | সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী |
| মানুষের ধর্ম | মো: বরকতুল্লাহ |
| মতিচূর | বেগম রোকেয়া সাখওয়াত হোসেন |
| পদ্মরাগ | ” |
| অবরোধ বাসিনী | ” |
| বাতায়ন | প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ |
| স্বামী বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র | স্বামী বিবেকানন্দ |
| চাই প্রিয় ব্যক্তিত্ব ও চাই প্রিয় নেতৃত্ব | আবদুস শহিদ নাসিম |
| বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থসমূহ থেকে নির্বাচিত কিছু হাদীস, যেমন:এন্তেখাবে হাদীস, রিয়াদুস সালেহীন | |

নীতি-নৈতিকতা শিক্ষা দেয় এমন কিছু রচনার পরিচিতি উপরে উল্লেখ করেছি। আরও অসংখ্য লেখক ও তাঁদের রচিত গ্রন্থ[১৮] রয়েছে যা সমাজতত্ত্ববিদ বা নীতি তত্ত্ববিদগণ স্বনামধন্য লেখকদের লেখা থেকে গবেষণার

১৭ . প্রাগুক্ত, পৃ.১৮০

১৮. নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী (১৮৩৪-১৯০৩): 'রূপজালাল' (১৮৭৬), 'তত্ত্ব ও জাতীয় সঙ্গীত' (১৮৮৭), 'সঙ্গীত সার', ও 'সঙ্গীত লহরী'।

গিরিশ চন্দ্র সেন (১৮৩৪-১৯১০):'হিতোপাখ্যান মালা' ১ম খণ্ড (১৮৭১), 'ধর্ম-বন্ধু' (১৮৭৬), 'হাফেজ বা হাফিজ' জীবনী (১৮৭৭), 'নীতিমালা' ১ম খণ্ড (১৮৭৭), 'দরবেশদিগের ক্রিয়া' (১৮৭৮), 'প্রবচনাবলী' (১৮৮০), 'তাপসমালা' জীবনী (১৮৮০), 'মহাপুরুষ চরিত' (১৮৮৪), 'ইমাম হাসান ও হোসাইন' (১৯০১), 'মহাপুরুষ মোহাম্মদ এবং তৎপ্রবর্তিত এছলাম ধর্ম' (১৯০৬), 'ধর্মবন্ধুর প্রতি কর্তব্য' (১৯০৬), 'ধর্ম সাধন নীতি' (১৯০৬), 'চারিটি সাধ্বী মোসলমান নারী' (১৯১৩) এবং বুখারী মুসলিমসহ বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থসমূহের বঙ্গানুবাদও তিনি করেছেন।

আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী (১৮৪৫-১৯১০):কাব্য গ্রন্থ: 'বিরাগ সঙ্গীত' (১৮৯০), 'প্রবোধ সঙ্গীত' (১৮৯১), 'প্রেমিক উদাসী' (১৮৯২),'উদাসী' প্রথম খণ্ড, (১৯০১) ও ইতিহাস গ্রন্থ: 'বাঙ্গালার মুসলমানগণের আদি বৃত্তান্ত' (১৮৯৯) ও নীতি বিষয়ক গ্রন্থ: 'সার সংগ্রহ'।

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১): ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধীয় রচনাগুলোর মধ্যে কাব্যগ্রন্থ: 'হজরত ওমরের ধর্ম জীবন লাভ' (১৯০৫), 'বিবি খোদেজার বিবাহ' (১৯০৫), 'হজরত আমীর হামজার ধর্মজীবন লাভ' (১৯০৫), 'মদিনার গৌরব' (১৯০৭), 'মোস্লেম বীরত্ব' (১৯০৭), জীবনীমূলক গ্রন্থ: 'হজরত বেলালের জীবনী' (১৯০৫), 'হজরত ইউসুফ' (১৯০৮), ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ: 'এসলামের জয়' ৯১৯০৮), মিলাদ: 'মৌলুদ শরীফ' (১৮৯৪), বিখ্যাত উপন্যাস: 'বিষাদ -সিন্ধু' (১৮৮৭), ও খুৎবা: 'ঈদের খোতবা' (১৯০৯)।

দীন মুহাম্মদ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯১৬): 'ক্রুসেড ও জেহাদ' (১৯০৮), 'কলিকাতায় গো-কোর্বানী হাঙ্গামা' (১৯১১)।

শেখ আবদুল জব্বার (১৮৮১-১৯১৮): 'মক্কা শরীফের ইতিহাস' (১৩১৩), 'ইসলাম চিত্র ও সমাজ চিত্র' (১৩২৭ বাংলা), 'মদিনা শরীফের ইতিহাস' (১৯০৭), 'ইসলাম সঙ্গীত' (১৩১৫), 'আদর্শ রমণী' (১৯১৭), 'জেরুসালম বা বয়তুল মোকাদ্দসের ইতিাহাস' (১৯১০), 'হজরতের জীবনী' (১৯১৪), 'আদম ও হাওয়া' (১৩৩২ বাংলা)।

সফিউদ্দীন আহমদ (১৮৭৭-১৯২২): 'জাতীয় ধর্ম শিক্ষা' (১৯১৩), 'শাফি-উল-এসলাম' (১৯১৩), 'হজরত বড় পীরের জীবনী' (১৯১৭), 'ছেলেদের হযরত মোহাম্মদ (দঃ)' (১৯১৮), 'মোসলেম শিক্ষা' বা মারফত তত্ত্ব (১৩২৫), 'তওহিদ বা একত্ববাদ' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (১৯২১), 'পাপের ফল' (১৯২২), 'মোতির মালা' (১৯২২), 'নবী নন্দিনী ফাতেমা জহরা' (১৯৩৪) ও 'হজরত আলী'

মুহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৭৮-১৯২৩): উপন্যাস: 'আনোয়ারা' (১৯১৪), 'হাসনগঙ্গা বাহমণি' (১৯১৭), 'প্রেমের সমাধি' (১৩২৫ বাংলা), 'পরিণাম' (১৯১৮), 'দুনিয়া আর চাইনা' (১৯২৪), 'গরীবের মেয়ে' (১৩৩৯ বাংলা), ও 'মেহেরউন্নিসা' (১৩৩১ বাংলা), প্রবন্ধ পুস্তক: 'বিলাতী বর্জন রহস্য' (১৯০৪) ও 'সাহিত্য প্রসঙ্গ' (১৯০৪)।

নওশের আলী খাঁ ইউসুফজয়ী (১৮৬৪-১৯২৪) 'বঙ্গীয় মুসলমান' (১৮৯১), 'মোসলেম জাতীয় সঙ্গীত', 'সাহিত্য প্রভা' (১৯১৪), 'উচ্চ বাঙ্গালা শিক্ষাবিধি' (১৯০১), 'উচ্চ শিক্ষা' (১৯১৫), 'নোটস অন মহামেডান এডুকেশন ইন বেঙ্গল' (১৯০৩)।

খান বাহাদুর কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬): জীবনী: 'নবীকাহিনী' প্রথমভাগ (১৯১৭), প্রবন্ধ: 'প্রবন্ধমালা' প্রথমভাগ, (১৯১৮) শিশু সাহিত্য: 'বোগদাদী গল্প' (১৯১৯), উপন্যাস: 'আবদুল্লাহ' (১৯৩২), বিজ্ঞান: 'মোসলেম জগতে বিজ্ঞান চর্চা' (১৩১১ বাংলা)।

খান বাহাদুর তসলীমুদ্দীন আহমদ (১৮৫২-১৯২৭): কোরআন অনুবাদ: 'তাবারাকাল্লাজী সুরার বঙ্গানুবাদ' (১৯০৭), 'কোরআন' প্রথম, দ্বিতয় ও তৃতীয় খণ্ড (ত্রিশ পারা) (১৯২২, ১৯২৪, ১৯২৫), 'আমপারা' (১৯০৯),' জন্মোৎসব বা মৌলুদ নফীসা' (১৯২৬), জীবনী: 'সাহাবিয়া' (১৯২৭),'সম্রাট পয়গম্বর' (১৯২৮)।

সৈয়দ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯): 'ঈদুল আজহা' (১৯০০), 'মৌলুদ শরীফ' (১৯০৩), 'প্রাইমারী এডুকেশন ইন রুরাল এরিয়াজ' (১৯০৬), 'মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়' (১৯১১), 'সভাপতির অভিভাষণ' (১৯১৯)।

শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন (১৮৭০-১৯৩০): ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ: 'হযরত ইসা কে ?' (১৯০৮), 'ইসলামী বক্তৃতা' (১৯০৮), 'শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদরীর ধোঁকা ভঞ্জন (১৯১৭), 'রদ্দে সত্য-ধর্ম নিরূপণ ও হেদায়াতুল খৃস্টান (১৯২৬) ও 'পাদৃ মন্‌রো সাহেবের ধোঁকা ভঞ্জন' (১৯২৭), 'ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে পরধর্মাবলম্বীদিগের মন্তব্য' (১৯০১),

জীবনীমূলক গ্রন্থ: 'আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত', জীবনী (১৮৯৮), 'মেহের চরিত' (১৯০৯), 'মাসুম হযরত মোহাম্মদ (দঃ) অর্থাৎ হজরতের নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্কতা' (১৯১৭), ইতিহাস ও কবিতা: 'জঙ্গেকারবালা' (১৯০৪), 'কোথা চলি গেলে' কবিতা (১৯০২)।

সৈয়দ আবুল হোসেন (১৮৬২-১৯৩০): 'মোসলেম পতাকা', 'হজরত মোহাম্মদের জীবনী' (১৯০৮), 'বঙ্কিম সমালোচনা' (১৯২২), 'মোসলেম পতাকা, তারিখুল ইসলাম, ১ম ও ২য় খণ্ড (১৯২৪), 'বাংলা মউলুদ শরীফ' (১৯২৪), 'বিবাহ বিভ্রাট' (১৯২৭) ও 'নূরজাহান' (১৯৩৩)।

শেখ আবদুর রহীম (১৮৫৯-১৯৩১): 'এসলাম তত্ত্ব' প্রথম খণ্ড, ধর্ম (১৮৮৯), [এম.আর.আহমদ ও শেখ এ. রহীম প্রণীত], 'এসলাম তত্ত্ব' ২য় খণ্ড, ধর্ম (১৮৮৯), [মুহম্মদ রিয়াজ উদ্দীন আহমদ ও শেখ আবদুর রহীম প্রণীত], 'ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ ও সমাজসংস্কার' ইতিহাস, (১৮৯০) [ মৌলভী মেয়রয়াজ উদ্দীন আহমদ ও শেখ আবদুর রহীম প্রণীত], 'আলহামরা' উপন্যাস (১৮৯১), 'প্রণয়যাত্রী' উপন্যাস (১৮৯২), 'ইসলাম' ধর্ম (১৮৯৬), 'ইসলাম ইতিবৃত্ত' ১ম খণ্ড, ইতিহাস (১৯১০), 'ইসলাম ইতিবৃত্ত' ২য় খণ্ড, ইতিহাস (১৯১১), 'ইসলাম নীতি' প্রথম ভাগ, ধর্ম (১৯২৫), 'ইসলাম নীতি' ২য় ভাগ, ধর্ম (১৯২৫)

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১): সিরাজীর কাব্য গ্রন্থগুলি হচ্ছে: 'অনল প্রবাহ' (১৯০০), 'আকাঙক্ষা' (১৯০৬), 'উচ্ছাস' (১৯০৭), 'উদ্বোধন' (১৯০৭), 'স্পেন বিজয় কাব্য' (১৯১৪), 'সঙ্গীত সঞ্জীবনী' (১৯১৬), 'প্রেমাঞ্জলী' (১৯১৬)। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হচ্ছে: 'রায়নন্দিনী' (১৯১৫), 'তারাবাঈ' (১৯১৬), 'ফিরোজা বেগম' (১৯১৮) ও 'নূরুদ্দিন' (১৯১৯)। তাঁর পাঠক নন্দিত প্রবন্ধ গ্রন্থগুলো হচ্ছে: 'তুরষ্ক ভ্রমণ' (১৯১৩), 'আদব কায়দা শিক্ষা' (১৯১৪), 'স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা' (১৯১৬), 'সুচিন্তা', 'স্বজাতি প্রেম' (১৯১৯), 'তুর্কী নারী জীবন', 'স্ত্রী শিক্ষা ও কারা কাহিনী' ইত্যাদি।

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২): 'মতিচূর' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, 'পদ্মরাগ', 'অবরোধ-বাসিনী', 'অগ্রন্থিত প্রবন্ধ', 'ছোটগল্প ও রস-রচনা' ' চিঠিপত্র', ' প্রবন্ধ'এবং 'অগ্রন্থিত কবিতা' Sultana's Dream'

মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩): জীবনীমূলক গ্রন্থ: 'মহর্ষি মনসুর' (১৮৯৬), 'ফেরদৌসী চরিত' (১৮৯৮), 'তাপস কাহিনী' (১৯০০), 'মাওলানা পরিচয়' (১৯১৪), 'খাজা ময়ীনউদ্দীন চিশতি', কাব্যগ্রন্থ: কুসুমাঞ্জলি' (১৮৮২), 'মহারাণা' (১৮৮৪), 'অপূর্ব দর্শন' (১৮৮৫), 'জুবিলী সঙ্গীত' (১৮৯৮), 'প্রেম-হার' (১৮৯৮), 'হজরত মাহম্মদ' ১ম খণ্ড (১৯০৩), 'জাতীয় ফোয়ারা' (১৯১২), উপন্যাস: 'জোহরা' (১৯১৮), 'দরাফ খান গাজী' (১৯১৯), শিশু সাহিত্য: 'হাতেম তাই', ইসলাম ধর্ম ও গান: 'আল- ার শত নাম ও নামের মাহাত্ম', 'ইসলাম সঙ্গীত' (১৩২২ বাংলা), ও ইতিহাস: 'শাহনামা' ১ম খণ্ড (১৯০৯)।

শেখ ফজলল করিম (১৮৮৩-১৯৩৬): জীবনীমূলক গ্রন্থ: 'মানসিংহ' (১৯০৩), 'হজরত এমাম রব্বানী মোজাদ্দাদে আলফসানী' (১৯০৫), 'মহর্ষি খাজা মইনুদ্দীন চিশ্তী (রাঃ) জীবন-চরিত' (১৯১৪), 'বিবি রহিমা' (১৯১৮), 'রাজর্ষি এবরাহীম' (১৯২৫), 'বিবি খদিজা' (১৯২৭), 'বিবি ফাতেমা' (১৯২৭), কাব্যগ্রন্থ: 'তৃষ্ণা' (১৯০০), 'পরিত্রাণ কাব্য' (১৯০৪), 'ভগ্নবীণা বা ইসলাম চিত্র' (১৯০৩), 'ভক্তি পুষ্পাঞ্জলী' (১৯১১), 'গাথা' (১৯১৩), 'জোয়ার ভাটা' (১৩২৫), উপন্যাস: 'লায়লী মজনু' (১৯০৪), ইতিহাস: 'আফগানিস্তানের ইতিহাস' (১৯২৭), তাসাউফ: 'এসবাত-উস-সামা বা সামাতত্ত্ব' (১৯০৩), ধর্ম: 'পথ ও পাথেয়' (১৯১৮), 'চিন্তার চাষ' (১৯১৬) ও শিশু সাহিত্য: 'সোনার বাতি' (১৯১৮), 'হারুন-অর-রশিদের গল্প' (১৯১৬)।

দাদ আলী (১৮৫২-১৯৩৬): মূলত তিনি কবি ছিলেন। কাব্যগ্রন্থসমূহ: 'ভাঙ্গা প্রাণ' প্রথম খণ্ড (১৯০৭), 'আশেকে রসূল' প্রথম খণ্ড (১৯০৮), ২য় খণ্ড (১৯১০) 'আখেরে মওত বা অন্তিমে মৃত্যু' (১৯১০), 'সমাজ শিক্ষা' (১৯৬৯), 'শান্তিকুঞ্জ' (১৯১৭), 'ভাঙ্গা প্রাণ', 'দেওয়ানে দাদ', 'ফরায়েজ' (ফিকহ), 'সঙ্গীত' 'উপদেশমালা' ইত্যাদি।

ডা: মুহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬): প্রবন্ধ গ্রন্থ: 'উন্নত জীবন' (১৯১৯), 'মহৎ জীবন' (১৩৩৩ বাংলা),'মানব জীবন' (১৯২৮), 'সত্য জীবন' (১৯৪০), 'উচ্চ জীবন' (১৩৬৯ বাংলা), কাব্যগ্রন্থ: 'প্রকাশ' (১৯১৬), উপন্যাস:'পথহারা' (১৯১৯), 'রায়হান' (১৩২৬ বাংলা), 'সরলা' (১৩২৬ বাংলা), 'প্রীতি উপহার' (১৯২৭), 'বাসর উপহার' (১৯৩৬) ইত্যাদি।

মতীয়র রহমান খান (১৮৭২-১৯৩৭): 'মোসলেম বধ' (১৩০৮ বাংলা), 'স্বপ্ন' (১৯২৬), 'দিল-ীনামা' (১৯০০) ও 'সম্রাট নাসিরুদ্দীন' (১৯২৮)।

আবুল হোসেন (১৮৯৬-১৯৩৮): 'মুসলিম কালচার' (১৯২৮), 'মনুষ্যত্ব' (১৯৩৪)।

মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৭-১৯৪০): প্রবন্ধ গ্রন্থ: 'ধর্মের কাহিনী' (১৯১৪), 'শান্তিধারা' (১৯১৯), শিশুসাহিত্য: 'নূর নবী' (১৯১৮), জীবনী: 'মানব মুকুট' (১৯২২), 'এয়াকুব আলী চৌধুরী অপ্রকাশিত রচনা' (১৯৯৩)।

আবদুল করিম (১৮৬৩-১৮৪৩): 'ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস' (১৮৯৮)।
দৌলত আহমদ (১৮৭০-১৯৪৪): 'নামজের উপদেশ' (১৯০৪), 'সমাজ-সংস্কার' (১৯১৪) ও 'কুসুমমঞ্জরী' (১৮৮৬)।
শেখ মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী (১৮৯৫-১৯৪৪): 'দরবেশ কাহিনী' (১৩৩৪ বাংলা), 'শিশুদের সিদ্দিক' (১৩৪৯), 'শিশুদের মোস্তফা' (১৩৪৯), 'শিশুদের জিন্নুরায়েন' 'নূরজাহান', 'শিশুদের ফারুক'।
আবদুল বারী কবিরত্ন (১৮৭৩-১৯৪৪): 'কারবালা' (১৯১৩), 'ভারতের যুবরাজ', ও 'ইসালে সওয়াব'।
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০): ইতিহাস বিষযকগ্রন্থ: 'কনষ্টান্টিনোপল' (১৯১৩), 'ভারতে মুসলমান সভ্যতা' (১৯১৪), 'ভারতে ইসলাম প্রচার' (১৯১৫), জীবনী: 'মহামান্য তুরস্কের সুলতান' (১৯০১), 'খাজা নেজামুদ্দীন আওলিয়া' (১৯১৬), 'আওরঙ্গজেব' 'মোসলেম বীরাঙ্গনা', প্রবন্ধ ও অভিভাষণ বিষয়ক গ্রন্থ: 'সমাজ সংস্কার' (১৯২৩), 'সুদ সমস্যা মুসলমান সমাজ' (১৩৩২ বাংলা), 'কোরআনে স্বাধীনতার বাণী' (১৯৩৯), 'এছলামের শিক্ষা' (১৩৫৪), 'ভূগোল শাস্ত্রে মুসলমান', 'খগোল শাস্ত্রে মুসলমান', 'এছলাম জগতের অভ্যুত্থান' ইত্যাদি।
কাজেম আল কোরায়শী কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১): 'অশ্রুমালা' (১৩০২ বাংলা), 'মহাশ্মশান' (১৯০৫), 'অমিয়ধারা' (১৯২৩), 'মহরম শরীফ বা আত্মবিসর্জন কাব্য' (১৯৩৩)।
এস. ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১): অভিভাষণ:'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি' (১৯২৬), 'সভাপতির অভিভাষণ' (১৯৩০), প্রবন্ধ গ্রন্থ: 'জীবনের শিল্প' (১৯৪১), 'ভবিষ্যতের বাঙালি' (১৯৪১), 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' (১৩৫১ বাংলা), 'সভ্যতা ও সাহিত্যে মুসলমানদের দান' (১৩৫৫বাংলা), 'ইবনে খালদুনের সমাজবিজ্ঞান' (১৩৫৬ বাংলা), 'মুসলিম সংস্কৃতির আদর্শ', ইতিহাস গ্রন্থ: 'গ্রানাডার শেষ বীর' (১৯৪০), 'আকবরের রাষ্ট্র সাধনা' (১৯৪৯), 'ইসলামের ইতিহাস', গল্প গ্রন্থ: 'গুল-দাস্তা' (১৯২৭), 'মাশুকের দরবার' (১৯৩০), 'দরবেশের দোয়া' (১৯৩১), 'বাদশাহী গল্প' (১৯৪৪), 'ভাঙ্গা বাঁশী', 'গল্পের মজলিস', 'পীর-পয়গম্বরদের কথা', 'ইরাণ-তুরাণের গল্প' ইত্যাদি।
আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ (১৮৬৯ বা ১৮৭১-১৯৫৩) 'ইসলাম ইতিবৃত্ত' (১৯০৪), 'ইসলামাবাদ' (১৯১৮), 'আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' (১৯৩৫), 'প্রাচীন মুসলমান কবিগণ' (১৯০৬)', 'মধ্যযুগের কবি ও কাব্যবিষয়ক অগ্রন্থিত প্রবন্ধ', ইতিহাস বিষয়ক অগ্রন্থিত প্রবন্ধ', ও 'লোকসংস্কৃতি বিষয়ক অগ্রন্থিত প্রবন্ধ' ইত্যাদি শিরোনামে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ রচনাবলী ১ম খণ্ড, আবুল আহসান চৌধুরীর সম্পাদনায় বাংলা একাডেমী ঢাকা থেকে ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে।
মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪): জীবনীমূলক গ্রন্থ: 'মোহাম্মদ আলী' (১৯২২), 'মহামানুষ মুহসিন' (১৯৩৪), 'সৈয়দ আহমদ' (১৯৩৫), 'নবাব আবদুল লতিফ' (১৯৩৬), মরু-ভাস্কর হজরত মোহাম্মদ (১৯৪১), 'কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ' 'ছোটদের হজরত মোহাম্মদ', 'ছোটদের হাতেম তাই' 'ছোটদের শাহনামা' ও অন্যান্য গ্রন্থ: 'সিন্দাবাদ-হিন্দবাদ', 'স্মার্ণা নন্দিনী' ও 'মণি-চয়নিকা'।
সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৮০-১৯৫৬): 'তাপসী রাবেয়া' (১৯১৭), 'সাহিত্যকুসুম' (১৯১৯), 'হাফেজা' (১৯২৯), 'ডালি' (১৯১২)।
মুহাম্মদ আবদুল হাকিম (১৮৮৭-১৯৫৭): 'প্রতিদান', (১৩২৭ বাংলা), 'ইসলাম সঙ্গীত' (১৩৩১ বাংলা), 'কোরআন শরীফ' (১৯২২-১৯৩৮), 'আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনে হানিফিয়া বাঙ্গালার উদ্দেশ্য' (১৯২৩)।
শেখ হবিবুর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৯১-১৯৬২): ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ: 'মালাবারে ইসলাম প্রচার' (১৯১৯), 'আলমগীর' (১৯১৯), 'ভারত সম্রাট বাবর' (১৯৩৬), ধর্ম: 'চেতনা' (১৯১৫), 'মরণের পরে' (১৯৫৫), 'ইসলাম ও অন্যধর্ম', জীবনী: 'আমার সাহিত্য জীবন' (১৯২৭), 'কর্মবীর মুন্সি মেহেরুল্লা' (১৯৩৪) ও 'ছেলেদের হজরত মুসা' (১৯৩৪), শিশুসাহিত্য: 'ছোটদের গল্প' (১৯৩৫), 'জেনপরী' (১৯২৮), 'পরীর কাহিনী' (১৯১৬)।
আবদুল গফুর সিদ্দিকী (১৮৭২-১৯৫৯): 'শহীদ তীতুমীর' (১৩৬৮ বাংলা)।
গোলাম মকসুদ হিলালী (১৯০০-১৯৬১): জীবনীমূলক গ্রন্থ: 'হজরতের জীবন নীতি' (১৯৬৫), 'আলবেরূনী' (১৯৩৭), ধর্ম ও অন্যান্য বিষয়: 'ইসলামে ধর্মনিরপেক্ষতা' (১৯৭৪), 'বাংলায় ফারসী-আরবী উপাদান (১৯৬৭), 'জাহানারা', 'ইরান ও তুরান' ইত্যাদি।
মুহাম্মদ সেরাজুল হক (১৯০৩-১৯৬৩): 'শিরাজী চরিত' (১৯৩৫), 'ইসলামের বৈশিষ্ট্য' (১৯৩৮), 'আমার জীবন কাহিনী' (১৯৬৬)।
কাজী আকরম হোসেন (১৮৯৬-১৯৬৩): ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ: 'ইসলামের ইতিহাস' (১৯২৪), 'ইসলাম কাহিনী' (১৯৩১), 'ইসলামের ইতিকথা' (১৯৩২) ইত্যাদি।

খান বাহাদুর আবদুর রহমান (১৮৮৯-১৯৬৪): জীবনীমূলক গ্রন্থ: 'মোসলেম নারী' প্রথম খণ্ড, (১৯২৮), 'চার ইয়ার' (১৯৩২), 'শেষ নবী', ধর্ম ও কুরআন হাদীসের বঙ্গানুবাদ: 'শিক্ষা বিজ্ঞান' (১৯৩৫), 'ইসলাম পরিচিতি' (১৩৫৯ বাংলা), 'ইসলামিক তমুদ্দুন ও পাকিস্তান' (১৯৫৬), 'নয়া খুতবা', 'জওয়াহিরুল কুর-আন' এবং কুরআন-হাদীসের প্রচুর অনুবাদ।

গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪): 'ইসলাম ও জেহাদ' (১৯৪৭), 'মরু-দুলাল', (১৯৪৮), 'ইসলাম ও কম্যুনিজম' (১৯৪৬), 'বিশ্বনবীর বৈশিষ্ট্য' (১৯৬০), 'অবিস্মরণীয় বই' (১৯৬০), 'আমার চিন্তাধারা' (১৯৬২), 'হজরত আবুবকর' (১৯৬৫)।

বেগম শামসুননাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪: 'পুণ্যময়ী' (১৩৩১বাংলা), 'বেগম মহল' (১৯৩৬), নূরন্নেসা খাতুন (১৮৯৪), খয়েরুন্নেসা খাতুন।

খান বাহাদুর আহছানউল্লা (১৮৭৩-১৯৬৫) : 'বঙ্গভাষা ও মুসলমান সাহিত্য' (১৯১৮), হেজাজ ভ্রমণ' (১৯২৫), 'মোসলেম জগতের ইতিহাস' (১৯২৫), ইছলাম ও আদর্শ মহাপুরুষ' (১৯২৬), 'হজরত মোহাম্মদ' (১৯৩১), 'ইছলামের ইতিবৃত্ত' (১৯৩৪), 'দরবেশ জীবনী (১৯৩৪) 'ভক্তের পত্র' (১৯৬৭), 'হজরতের রচনাবলী' (১৯৪০), 'কোরআনের সার' (১৯৪১), 'বিশ্বশিক্ষক' (১৯৪৯), 'সৃষ্টিতত্ত্ব' (১৯৪৯), 'রাজর্ষি আওরঙ্গজেব ও মোসলেম সভ্যতা' (১৯৪৯), 'হজরত মহর্ষি রুমী' (১৯৫০), 'ইসলামের দান' (১৯৫৮) ইত্যাদি আরও গ্রন্থ রয়েছে।

গোলাম হোসেন (১৮৭৩-১৯৬৫): 'বঙ্গদেশীয় হিন্দু-মুসলমান' (১৯১১), 'দিল্লী-আগ্রা ভ্রমণ' (১৯১২), 'নীতি-প্রবন্ধ মুকুল'।

মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী (১৯০৬-১৯৬৬): জীবনীমূলক গ্রন্থ: 'আমীর আলী' (১৯৩০), 'ওমর ফারুক' (১৯৩১), 'কবি ইকবাল', 'সৈয়দ আহমদ', 'মুহম্মদ আলী', 'মরু-ভাস্কর' ইতিহাস: 'মিশর বিজয়', 'বন্দীবীর, 'পাকিস্তান' ইত্যাদি।

মৌলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮): 'সমস্যা ও সমাধান' '১৯৩১), 'মোস্তফা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য' (১৯৩২), 'উম্মুল কেতাব' (১৯২৯), 'মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' (১৯৬৫), 'তাফছীরুল কোরআন' (১৯৫৯), 'বাইবেল নির্দেশ ও প্রচলিত খৃষ্টান ধর্ম' (১৯৬২)।

মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯): 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (সৈয়দ আলী আহসান সহযোগে, ১৯৫৬), 'ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান'।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯): 'ইসলাম প্রসঙ্গ' (১৯৬৩), 'শেষ নবীর সন্ধানে' (১৯৬১), 'মহরম শরীফ' (১৯৬২), 'প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে শেষনবী' (১৯৫২), 'বাংলায় ইসলামী বিশ্বকোষ', 'বাংলা সাহিত্যের কথা' (১৯৬৫)।

মুহাম্মদ এমদাদ আলী (১৮৯১-১৯৬৯): 'তরিকোল ইসলাম বা মোসলেম নীতি' (১৯১৭), 'জুমার দ্বিধাভঞ্জন' (১৯১৮), 'মোসলেমমালা' (১৯২০), 'মিলনযুগ বা নীতিরহস্য' (১৯২১), 'কুরীতি জীবন' (১৯২৩), 'হক কথা' (১৯২৮), 'উপদেশমালা' (১৯৩০), 'ওয়াজে ইসলাম' (১৯৩০), 'স্বভাব দর্পণ' (১৯৩৫), 'হজরতের ভবিষ্যৎ বাণী বা বর্তমান দশা' (১৯৩৭), 'স্বামী-তর্কযুদ্ধ বা শান্তিসোপান (১৩৪৭ বাংলা), 'চারি তরিকার সংক্ষিপ্ত অজিফা' (১৯৩৯), 'আমার সৌভাগ্য জীবন' (১৯৫৪)।

হুমায়ুন কবীর (১৯০৬-১৯৬৯): 'মোসলেম রাজনীতি' (১৯৪৩)।

কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০) 'হজরত মোহাম্মদ ও ইসলাম' (১৯৬৩), 'পবিত্র কোরআন' প্রথম খণ্ড, (১৯৬৬), 'মক্তব সাহিত্য' (১৯৩৬) ইত্যাদি।

আবদুল মওদুদ (১৯০৮-১৯৭০): 'ইসলাম যা ইউরোপকে শিখিয়েছে' (১৩৫৪ বাংলা), 'কামেল নবী (১৩৫৫ বাংলা), 'মুসলিম মনীষা' (১৯৫৫), 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমান' (১৩৭০), 'শাহ আবদুল ভিটাই' (১৯৬৪), 'হযরত ওমর' (১৯৭৮), মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশঃ সংস্কৃতির রূপান্তর' (১৯৬৯), 'ওহাবী আন্দোলন' (১৯৬৯) ইত্যাদি।

গোলাম রহমান (১৯৩১-১৯৭২): 'নেতা ও নবী' (১৩৩২ বাংলা), 'পানুর পাঠাগার' (১৯৫৯)।

আবুল কাসিম মুহাম্মদ আদামুদ্দীন (-মৃত্যু-১৯৭২): 'তহফতুল ফালাসিফা' (১৩৭১ বাংলা)।

ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪): 'সাত সাগরের মাঝি' (১৯৪৪), সিরাজাম মুনিরা' (১৯৫২)।

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৪): 'পারস্য প্রতিভা' ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড (১৯২৪, ১৯৩২), 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৪), 'কারবালা' (১৯৫৭), 'নবীগৃহ সংবাদ' (১৯৬০), 'নয়াজাতি স্রষ্টা হজরত মুহম্মদ' (১৯৬৩), 'হজরত ওসমান (১৯৬৯)।

নুরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী (১৮৯৪-১৯৭৫): 'ভারতে মোসলেম বীরত্ব' (১৯২৪), 'মোসলেম বিক্রম ও বাংলার মোসলেম রাজত্ব' (১৯২৯)।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬): 'কাব্যে আমপারা' (১৯৩৩), 'অগ্নিবীণা' (১৯২৮), 'যুগবাণী' (১৯২২), 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' (১৯২৩), 'দুর্দিনের যাত্রী' (১৯২৬), 'রুদ্র মঙ্গল' (১৯২৭), 'সাম্যবাদী' (১৯২৫), 'সঞ্চিতা' (১৯২৮), 'নজরুলের

মাধ্যমে সিলেবাস উপযোগী করে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করবেন। দেশাত্মবোধক কিছু গানও এ চিন্তার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে। যেমন : 'এই পদ্মা এই মেঘনা', 'জন্ম আমার ধন্য হলো মা গো' ইত্যাদি।

---

প্রবন্ধ সমগ্র' (১৯৯৭), 'সঞ্চিতা' (১৩৬২ বাংলা) নবম সংস্করণ, 'নজরুল ইসলাম ইসলামী কবিতা' (১৯৮২), 'মরু-ভাস্কর' (১৯৩০)।

মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা (১৯০০-১৯৭৭): 'পবিত্র কোরাণের পূত কথা' (১৩৫২ বাংলা)।

শামসুর রহমান চৌধুরী (১৯০২-১৯৭৭): 'ফকিরের কারামত' (১৯২৪), 'বেহেস্তের সওগাত' (১৯২৫), 'ইমাম আজম' (১৯২৬), 'ইসলাম প্রচার' (১৯২১), 'মোহাম্মদ আলী' (১৯৩২) ইত্যাদি।

প্রিন্সিপাল ইবরাাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮): 'সোনার শিকল' (১৯৩৯), 'ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র' (১৩৬১ বাংলা), 'বাদশাহ বাবর' (১৯২৭), 'সম্রাট ছালাহউদ্দীন' (১৯২৭), 'ইসলামের বাণী' (১৯৩৯), 'ইসলামের ঔদার্য' (১৯৪৮), 'জঙ্গী জীবন' (১৯৫৩), 'আরব জাতির ইতিকথা' (১৯৫৯), 'মহিয়সী নারী' (১৯৫৯), 'ইসলামের মর্মকথা' (১৯৫৯), 'চেঙ্গীস খাঁ' (১৯৫৯), 'ছোটদের মহানবী' (১৯৬১), 'হজরত ওমর ফারুক (১৯৬১) ইত্যাদি।

আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯): 'মুসলমানী কথা' (১৯২৮), 'ছোটদের কাসাসুল আম্বিয়া' (১৩৬১ বাংলা)।

মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০২-১৯৮২): 'বঙ্গে সুফী প্রভাব' (১৯৩৫), 'পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম' (১৯৪৮), 'মুসলিম-বাংলা সাহিত্য' (১৯৫৭) ইত্যাদি।

বেনজীর আহমদ (১৯০৩-১৯৮৩): 'ইসলাম ও কম্যুনিজম' (১৯৪৫)।

শইখ শরফুদ্দীন (১৯০০-১৯৮৪): 'পবিত্র জীবন' (১৯৭৮)।

ডক্টর এম আবদুল কাদের (১৯০৮-১৯৮৪): 'মোসলেম কীর্তি' (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড), 'টিপু সুলতান' (১৯৩২), 'হায়দর আলী' (১৯৩২), 'স্পেনের ইতিহাস' (১৯৩৫), 'মুর সভ্যতা' (১৯৩৬), 'তুরস্কের ইতিহাস' ১ম ও ২য় খণ্ড', 'সোলতান সালউদ্দীন' (১৯৪০) ও 'ইসলামের নীতি' (১৯৫০)।

আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪): 'বাংলা কাব্যের ইতিহাস: মুসলিম সাধনার ধারা' (১৯৭০), 'কবি নজরুল' (১৯৭০)।

মুজিবর রহমান খাঁ (১৯১০-১৯৮৪): 'সাহিত্য ও সাহিত্যিক' (১৯৭১), 'মহানবী' (১৯৮০)।

আবুল হাসানাত (১৯০৫-১৯৮৫): 'তরিকৎ বা খোদাপ্রাপ্তি' (১৯৩৮)।

মুহম্মদ নূরুল হক (১৯০৭-১৯৮৭): 'শেষ নবীর বাণী' (১৯৭০), 'বিগত যুগের আদর্শ' (১৯৮১)।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন (১৯০৪-১৯৮৭): 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা' (১ম- ৯ম খণ্ড), 'ইরানের কবি' (১৯৬৮)।

কাজী আবদুল মান্নান (১৯২৮-১৯৯৪): 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা' (১৯৬১)।

সুফী জুলফিকার হায়দার (১৮৯৯-১৯৮৭): 'জেহাদের আহ্বান' (১৯৬৫), 'বিপ্লব বিপ্লব সত্যের বিপ্লব' 'আশরাফুল মাখলুকাত' (১৩৮৭ বাংলা), 'নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়' (১৯৭০)।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ (১৯০৬-১৯৯৯): 'তমুদ্দনের বিকাশ' (১৯৪৯), 'সত্যের সৈনিক আবু জর' (১৯৫২), 'জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম' (১৯৫৯)।

আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯১৪-): 'তাপস কাহিনী' (১৯৩৯), 'আবু বকর সিদ্দিক' (১৯৪৬), 'মহা কবি ইকবাল' (১৯৫৩), 'হজরত ইউসুফ' (১৯৬২), 'ইসলাম পরিচিতি' (১৯৬৩), 'সংঘাতের মুখে ইসলাম' (১৯৬৩), 'ইসলামের মুক্তপন্থা' (১৯৬৯)।

মনিরুদ্দীন ইউসূফ (১৯১৭-২০০০): 'হজরত ফাতেমা' (১৩৭১ বাংলা), 'হজরত আয়েশা' (১৩৭৫ বাংলা), 'আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি' (১৩৮৫ বাংলা), 'বাংলা সাহিত্যে সুফী প্রভাব', 'সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ', 'সংস্কৃতি চর্চা' ইত্যাদি।

আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩): 'কোরানের বাণী' (১৯৪৯), 'হযরত আলী' (১৯৬৮), 'সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধাবলী' (১৯৮০)।

কাজী দীন মুহম্মদ (১৯২৭-): 'মানব জীবন' (১৯৭০), 'ইসলামী সংস্কৃতি' (১৯৭০), 'সুফীবাদের গোড়ার কথা' (১৯৮১)।

**গবেষণার ফলাফলঃ**

১. উচ্চ শিক্ষিত হয়েও নীতি-নৈতিকতার প্রতি উদাসীন।
২. কর্মজীবনে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় নৈতিকতা ও দেশপ্রেমের বিষয় এড়িয়ে চলা।
৩. পদমর্যাদা ও পদন্নোতির জন্য সবধরনের নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ বিসর্জনের মানসিকতা বৃদ্ধি।
৪. প্রশাসনিক বা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত থাকা অসাধু বা অনৈতিক ব্যক্তিবর্গের দ্বারা নতুন প্রজন্মকে পথভ্রষ্টতার দিকে প্রভাবিত করণ।
৫. শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে নীতি-নৈতিকতা পরিলক্ষিত না হলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়- এ বিষয়টিরও প্রমাণ মিলে এ গবেষণায়।

**প্রস্তাবনা ও উপসংহার ঃ**

১. প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে নীতি-নৈতিকতা বিষয়ে পাঠদানের জন্য সিলেবাস, শিক্ষাসামগ্রী ও উচ্চমানের শিক্ষকমণ্ডলী থাকা প্রয়োজন।
২. নীতি-নৈতিকতার উপর লিখিত ও প্রকাশিত বই-পুস্তকের গ্রন্থপঞ্জি ও গ্রন্থসমূহ সকল পর্যায়ের ছাত্র-শিক্ষকের সংগ্রহে থাকা ও প্রয়োজনে বিনামূল্যে বিতরণ করা উচিৎ বলে আমি মনে করি।
৩. নীতিবান বা আদর্শ মানুষের জীবনী বা উদাহরণও এ ক্ষেত্রে পাঠের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যারা কঠিন পরিস্থিতিতেও নীতি-নৈতিকতার সাথে কখনও আপোষ করেন নাই, এমন ঘটনাও শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপন করা যেতে পারে।
৪. দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধক গান, কবিতা, প্রবন্ধ ও নিবন্ধ ইত্যাদির মাধ্যমে পাঠকের মনে নীতি-নৈতিকতা দীর্ঘস্থায়ী করা যেতে পারে।
৫. প্রত্যেক বিভাগের, প্রত্যেক কোর্সের সম্মানিত শিক্ষক তাঁর বিষয় পাঠদানের পাশাপাশি নীতি-নৈতিকতা শিক্ষাদানের উপরও কিছু দৃষ্টি আকর্ষণী দিবেন; যাতে পেশাগত জীবনে শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞান ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনৈতিক ও অসাধু পথ অবলম্বন করাকে পাপ মনে করেন ও ঘৃণা করেন।

এ কথা সত্য যে নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শ চরিত্র না থাকলে, একজন শিক্ষিত মানুষের মূল্য অশিক্ষিতের চেয়েও নীচে। রাষ্ট্র ও সমাজ শিক্ষার পেছনে যে শ্রম ও অর্থ ব্যয় করছে তা যদি মানুষের কল্যাণে প্রভাব ফেলতে না পারে, তাহলে এই শ্রম ও অর্থ ব্যয় পুরোটাই বৃথা। ডাক্তার, প্রকৌশলী, অর্থনীতিবিদ সকলেরই নীতিজ্ঞান ও দেশপ্রেম থাকা উচিত। আর নীতি জ্ঞান বিষয়ে সুনির্দ্দিষ্ট কোন কোর্স থাকলে, এর উপর বই পড়লে, পরীক্ষা দিলে তা তাদের জীবনে একটা সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে। এই ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে যেসব মহান ব্যক্তি নীতি-নৈতিকতার উপর বই পুস্তক লিখেছেন, তাদের চিন্তা চেতনা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পাঠ্য পুস্তক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শ চারিত্রিক বিষয়ক প্রবন্ধ, গল্প ইত্যাদি উঠিয়ে দিয়ে দেশ, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক লেখা স্থান পাচ্ছে। যার ফলে,

নতুন প্রজন্ম বের হচ্ছে একেবারেই নীতি জ্ঞান শূণ্য হয়ে। পৃথিবীতে অনেক দেশেই এমন শিক্ষা ব্যবস্থা আছে; যারা নীতি-নৈতিকতাকে সামনে রেখে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সাজিয়েছেন, গড়ে তোলেছেন উন্নত জাতি। তাই, আমার প্রস্তাব হচ্ছে নীতি জ্ঞান, দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধ এগুলোর উপর সুনির্দ্দিষ্ট কিছু কোর্স সব ডিসিপ্লিনের শিক্ষার্থীদেরই সিলেবাসে থাকা উচিত। আর এ সম্পর্কিত বই পুস্তক ছেলে-মেয়েদের দেশ ও জাতি সম্পর্কে উন্নত কিছু ভাবতে শিখাবে। দেশকে গড়ার জন্য যে উন্নত জাতি আমরা আশা করছি, তা সাহিত্য ও নীতি জ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের থেকেই দ্রুত পাওয়া সম্ভব।